দলমার হাতি ও মানবসভ্যতা

মৌসুমী মজুমদার

ঃ একটি আলোচনা

আজকাল প্রায়ই শোনা যায় দলমা'র দামাল হাতির তাণ্ডবলীলা, হত্যালীলার কাহিনী। বিশেষ করে পশ্চিম মেদিনীপুরের বিনপুর,বেলপাহাড়ি, জামবনী, শালবনী, গোয়ালতোড়, ঝাড়গ্রাম, গড়বেতা, মেদিনীপুরের ব্লকগুলিতে স্থলভাগের এই বৃহত্তম প্রাণীটির দলবদ্ধ দাপটে আদিবাসীরা সর্বদাই ত্রস্ত। বিশেষতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত এই ব্লাকগুলিতে বেশিরভাগ মানুষই কৃষি এবং বনভূমির ওপর নির্ভরশীল। অথচ ফি বছর শস্য পোকার সময় এই দলবদ্ধ জীবটির অত্যাচারে নাজেহাল এইসব গরীব কৃষিজীবী মানুষরা। অনেকসময় শস্য বাঁচানোর তাগিদে অথবা হাতির মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রাণ দেন হতভাগ্য কিছু গ্রামবাসী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই জীবনটি কি সত্যিই অশান্ত, খুনে প্রকৃতির? আমি নিজে প্রায় দশবছর এই অঞ্চলে গবেষণার কাজে রত থাকার ফলে, খুবই কাছ থেকে এদের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা এবং গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলার সুযোগ পাই। অন্তত একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যে বাস্তবেএই হাতিরা খুবই শান্ত প্রকৃতির। প্রবল বুদ্ধিমান। এরা দলবদ্ধভাবে ঘোরাফেরা করতে ভালোবাসে। আদ্যোপান্ত তৃণভোজী এই প্রাণীরা মূলত আমপাতা, কলাগাছ, কাঁঠাল প্রভৃতি খেতে পছন্দ করে। তাই সত্যিই অবাক হতে হয় হাতিদের এহেন স্বভাববিরোধী ব্যবহারে। তবে হাতিদের এই স্বভাবের পরিবর্তনের পেছনে প্রধান মূলত আমপাতা, কলাগাছ, কাঁটাল প্রভৃতি খেতে পছন্দ করে। তাই সত্যিই অবাক হতে হয় হাতিদের এহেন স্বভাববিরোধী ব্যবহারে। তবে হাতিদের এই স্বভাবের পরিবর্তনে পেছনে প্রধান দায়ী মনে হয় মনুষ্যসমাজ। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, শিল্পায়ন প্রভৃতির নামে মানুষ যে প্রকৃতির ওপরপ্রভুত্ব ফলানোর খেলায় মেতে উঠেছে তারই ফলস্বরূপ বনভূমি ধবংস, পাহাড় পর্বতে খোঁড়াখুঁড়ি। আরও অনেক কিছু দলমার এইহাতির আসলে বিহার বা অধুনা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বাসিন্দা। ঝাড়খণ্ডের রাঁচি জেলার লাটাইসিনি অঞ্চলে এদের আদি বাসস্থান। নগরায়ন বা শিল্পায়নের সাথে সাথে এই অঞ্চলে অবাধ বনভূমি ধবংসের ফলে এইসব হাতির দৈনন্দিন খাদ্যসম্ভারে টান পড়ে। ফলে খাদ্যের সন্ধানে এইসব হয়ে ওঠে আর একটি ব্যাপারে, তা হল দলমার পাহাড় অঞ্চলে গ্রানিট পাথর উত্তোলনের জন্য ক্রমাগত ডিনামাইট বিস্ফোরণ। ফলে এই বিশাল হাতির দল নিজ বাসস্থান ছেড়ে কাঁকড়াঝোড়, রামবাঁধ, পুলিয়ার লোকালয়ে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে। প্রথম প্রথম এরা কাঁসাইনদী পেরিয়ে আসত না। ১৯৮৭ সাল নাগাদ এই হাতির দল প্রথম লালগড়, তারপর ধীরে ধীরে নয়াবসত এবং ১৯৯১ সাল নাগাদ প্রথম শিলাবতী নদী পেরিয়ে গড়বেতায় প্রবেশ করে। আসার লক্ষ্য একটাই - খাদ্য। এক একটি হাতির প্রতিদিন প্রায় ৫০ কেজি খদ্যের প্রয়োজন এবং সাধারণত, শস্যপোকার সময় অর্থাৎ অক্টোবর - নভেম্বর মাস নাগাদ মেদিনীপুরের বিভিন্ন জায়গায় প্রবেশ করে। এক একটি হাতির দলে ৪০-৫০ টি হাতি থাকে। এদের দলের দলনায়ককে 'টাস্কার' বলা হয়। সে পুরো দলটি কোনপথে যাবে তা ঠিক করে। এই হাতিটি অবশ্যই মেয়ে হাতি হয়। মূল দল থেকে টাস্কার হাতিটি প্রায় ১-১১/২ কিলোমিটারর দূর থেকে এক অদ্ভুত আওয়াজের মাধ্যমে দলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। একটি হাতির দলে অনেক রকমের হাতি থাকে। যেমন -- 'মাকনা' অর্থাৎ পুষ, হাতি, যার দাঁত বের হয় নি, আবার 'গণেশহাতি' অর্থাৎ যার একটি মাত্রদাঁত আছে

ইত্যাদি। একটি দলে একাধিক ছেলে হাতি থাকায় দলে মেয়ে হাতির ওপর অধিকার নেওয়ার জন্য পুষ হাতিগুলি মারামারি করে। মারামারির ফলে যে হাতিটি হেরে যায় তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এটাই হাতি সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম। ফলে যে হাতিটি দল থেকে বহিষ্কৃত হল সেই হাতিটি দলছাড়া হলে লোকালয়ে স্থায়ীভাবে রয়ে যায়। এদেরকেই 'রেসিডেন্সিয়াল এলিফ্যান্ট' বলা হয়। আর 'দলভুক্ত' হাতিগুলিকে 'মাইগ্রেটরি এলিফ্যান্ট/ যাযাবর হাতি' বলা হয়।
এখন তো খবরের কাগজের পাতায় উল্টালে প্রায় চোখে পড়ে হাতির আক্রমণে মৃত বা আহত। আসলে হাতি খাদ্য শস্যের জন্য এবং আদিবাসীদের তৈরি মহুয়াফল থেকে প্রস্তুত একপ্রকার মদের লোভে লোকালয়ে প্রবেশ করে। এই মহুলমদ হাতির খুব প্রিয়। এর জন্য হাতি ঘরের দেওয়াল ভেঙে ঢুকে পড়ে। তাছাড়া এই মদ খেয়ে নিলে হাতি মত্ত হয়ে পড়ে এবং এই মত্তহাতির সামনে পড়ে অনেকে মারা পড়েন। তাছাড়া গ্রামবাসীদেরও অনেকে মত্তমাতাল অবস্থায় হাতিকে সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রতিরূপ ভেবে প্রণাম করতে গেলেও পদপৃষ্ট হয়ে মারা পড়েন। তাছাড়া অনেক গ্রামবাসী হাতির দল থেকে বাচচা হাতি ধরে যায় পোষার জন্য। সেক্ষেত্রেও ক্ষিপ্ত মা হাতির রোষে পড়ে অনেকে মারা যান। তবে ভয়ের ব্যাপার হল হাতির আক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে।

সাল ১৯৮৬-৮৭ ৮৭-৮৮ ৮৮-৮৯ ৮৯-৯০ ৯০-৯১ ৯১-৯২
মৃতের সংখা ০০ ০৫ ১৮ ১৫ ১৫ ১৩
সাল ১৯৯২-৯৩ ৯৩-৯৪ ৯৪-৯৫ ৯৫-৯৬ ৯৬-৯৭ ৯৭-৯৮
মৃতের সংখ্যা ০৬ ২০ ১০ ১২ ০৬ ১৪
সাল ১৯৯৮-৯৯ ৯৯-২০০০ ২০০০-০১
মৃতের সংখ্যা ০২ ০৫ ১৯
(তথ্যসূত্র স্টেট রিপোর্ট ২০০১)

তবে হাতির হাত থেকে বাঁচার জন্য বনদপ্তর নানাভাবে গ্রামবাসীদের সাহায্যও করে চলেছেন। যেমন হাতির দলকে কৃষিক্ষেত থেকে তাড়ানোর জন্য জ্বলন্ত মশাল বা হুলা জ্বালাবার জন্য বনদপ্তর কেরোসিন সরবরাহ, জনগণকে সচেতন করা প্রভৃতি ব্যবস্থা করে। তবে অসম্ভব বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন হাতিরাও মানুষের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পিছপা হয় না। এ নিয়ে মজার ঘটনাও রয়েছে। যেমন, বনদপ্তর হাতির দলকে মেদিনীপুরে ঢুকতে না দেওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক তারের বেড়া দেন। ফলে কিছুদিন হাতির পালকেআটকে রাখা সম্ভব হলেও হাতির দল বড় গায়ের গুড়ি এনে ঐ বৈদ্যুতিক তারের এপর ফেলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে যথারীতি পুরানো পথে প্রবেশ করেছে এমন ঘটনাও ঘটে। আবার এমনি বেড়া ভেঙে অথবা তলার দিকে গর্ত করে ঢুকে পড়েছে তার বেড়ার এপারে। তাছাড়া অনেকসময় দেখা গেছে গ্রামবাসী বা হুলাপার্টির তাড়া খেয়ে হাতির দল নিরাপদ দূরত্বে অপেক্ষা করে। সারারাত পাহারা দেওয়ার পর গ্রামবাসীরা ভোররাতের দিকে ঝিমোতে থাকলে বা ঘুমিয়ে পড়লে হাতির দল ফসলক্ষেতে ঢুকে পড়ে এবং সব লণ্ডভণ্ড করে চলে যায়।
সুতরাং একটা ব্যাপার স্পষ্ট, আজ এই হাতিদের অত্যাচারের জন্য দায়ী কিন্তু মানুষ ও মানুষের লোভ। কারণ দলমার দামালরা কিন্তু মানুষে তাদের শত্রু ভাবে না। কারণ এইসব অঞ্চলে আদিবাসীদের মুখ থেকে অনেক জনশ্রুতি শুনেছি। যেমন, একবার এক বৃদ্ধাকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে মেরে ফেলার পর ঐ ঘাত হাতিটি বেশ কিছুদিন ঐ ঘটনাস্থলে প্রত্যেকদিন শুঁড়ে করে জল দিয়ে যেতএবং কিছুক্ষণ বসে কাঁদত। আবার হাতির স্মৃতিশক্তিও প্রখর। তাই এইসব নিরীহ প্রাণীগুলোর যদি পর্যাপ্ত অন্নসংস্থান তথা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যায় তা হলে মনে হয় না এখানকার আদিবাসীদের ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হবে। যদি বনদপ্তর থেকে হাতিরখাওয়ার জন্য পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলে আম, কাঁঠাল, বাঁশ প্রভৃতি হাতির প্রিয় খাদ্যতালিকার গাছগুলি রোপন করা যায়, তবে এদের হাত থেকে বাঁচা সম্ভব। যদিও সরকার মৃত পরিবার পিছু বীমা করার মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তবুও আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ও বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা করতে এই হস্তিকুলের জন্য সঠিক, সুচিন্তিত মতামত ও পরিচালন ব্যবস্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com